بسم الله الرحمن الرحيم

IOM

কুরআন-হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

Submitted to:

Ustaz Abdul Wahid

Subject : RAM 302

Submitted by:

Mrs. Kaniz Fatema Dina

Batch: 202

Roll No: 20102093202

সূচিপত্র

লেখকের কথা……………………………………………………………………………………..…3

সারসংক্ষেপ...4

ভূমিকা...7

রমজান কি ? 8

রমজানের ইতিহাস..9

রমজানের গুরুত্ব……………………………………………………………………………..……10

- সাওমের মিষ্টতা………………..……………………………………………..…...13
- রোজার বিনিময় জান্নাত……………………………………………………….…..….14
- রোজাদারের আনন্দ……………………………..……………………………..…...14
- জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ………………………………………………………..…..15
- রোজা অদ্বিতীয় ইবাদত……………………………………………………..……..15
- রোজার সুপারিশ…………………………………………………………………..…15
- দোয়া কবুল হওয়া…………………………………………………………………16
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম...16

রমজানের ফযীলত…………………………………………………………………………….17

- “সাওম কেবল আমারই জন্য” 17
- আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন...........................21
- রোযা হল জান্নাত লাভের পথ...21
- রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে ‘রাইয়ান’ নামক বিশেষ দরজা দিয়ে................22
- রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ...23
- রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে...25
- রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়...25
- রোযা গুনাহের কাফফারা..26
- রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত...27
- রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত..27
- রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে..................................27
- রোযাদারের দুআ কবুল হয়..28
- রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়...28
- এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সওয়াব..29

রমজানের তাৎপর্য ও শিক্ষা…………………………………………………..………..…31

শেষ কথা……………………………………………………………………….……………32

লেখকের কথা

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। যিনি এতো বড় একটি কাজ আমার জন্য সহজ করেছেন এবং আমাকে রিসার্চ ও মাসায়েল বিষয়ক এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি এসাইনমেন্ট পরিপূর্ণ করার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

এই এসাইনমেন্টের উসিলায় রমাদানের গুরুত্ব এবং ফযিলত আরো অনেকটা গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ আমার রব করে দিয়েছেন।সবার কাছে অনেক অনেক দুয়া চাই।আল্লাহ যেনো আমার ইলমে আরো বারাকাহ দান করেন। আমাকে সহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের প্রিয় নবিজি(সা) এর সাথে, সাহাবিদের সাথে, রহমানের বান্দাদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করে নেন।

পরিশেষে বলতে চাই, এসাইনমেন্টের কোন অংশে ভুল এবং অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে অবহিত করে সংশোধনের সুযোগ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

কানিজ ফাতেমা দিনা

ইমেইলঃ kanizdina817@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রহমত বরকত ও মাগফেরাতের মাস রমযান। এই মাস তাই সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই চায় কীভাবে এ মাস থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়া যায়। সবাই আন্তরিকভাবে কামনা করে নিজেকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র একটি জীবন শুরু করতে।

হিজরী পঞ্জিকার বারোটি মাসের মধ্যে শুধুমাত্র একটি মাসের নামই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আর সে মাসটি হলো রমযান। যা এ মাসটির অসামান্য মর্যাদা পরিচয় বহন করে।7রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:"রোযা একান্তই আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেবো।"

পরকালে যে তিনি কী পুরস্কার দেবেন তার কিছুটা ইঙ্গিত নবী কারিম (সা.) আমাদের দিয়েছেন। সে থেকে রোযাদারগণ নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবার আনন্দ পাবেন। রাসূলে খোদা বলেছেন,'রমযান এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তোমাদের জন্যে রোযা রাখাকে ফরজ করে দিয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় রোযা রাখবে,তার জন্যে রোযার সেই দিনটি হবে এমন যেন সবেমাত্র সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে,অর্থাৎ রোযাদার তার সকল গুণাহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিষ্পাপ শিশুটির মতো হয়ে যাবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পবিত্র রমজানের ফজিলত,গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,পবিত্র রমজান মাস দয়া,কল্যাণ ও ক্ষমার মাস। এ মাস মহান আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসের দিনগুলো সবচেয়ে সেরা দিন,এর রাতগুলো শ্রেষ্ঠ রাত এবং এর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান ।রহমত বরকত ও মাগফিরাতের মাস তথা পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর দস্তরখান আমাদের জন্যে উন্মুক্ত। তিনি তোমাদেরকে এ মাসে সম্মানিত করেছেন। এ মাসে তোমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস মহান আল্লাহর গুণগান বা জিকিরের সমতুল্য;এ মাসে তোমাদের ঘুম প্রার্থনার সমতুল্য,এ মাসে তোমাদের সৎকাজ এবং প্রার্থনা বা দোয়াগুলো কবুল করা হবে। তাই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক ও পবিত্র চিত্তে প্রার্থনা করো যে,তিনি যেন তোমাদেরকে রোজা রাখার এবং কোরআন তেলাওয়াতের তৌফিক দান করেন।গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হও ও তওবা কর এবং নামাজের সময় মোনাজাতের জন্যে হাত উপরে তোলো,কারণ নামাজের সময় দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়,এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান,এ সময় কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন,কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি জবাব দেন,কেউ কাকুতি-মিনতি করলে তার কাকুতি মিনতি তিনি গ্রহণ করেন ।কেননা পবিত্র কোরআনে সুরা গাফিরের ৫৯ নম্বর আয়াতে তিনি নিজেই বলেছেন,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমরা আমাকে ডাক,আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো,নিশ্চয় যারা আমার আমার ইবাদত হতে বিমুখ,তারা লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী (সা.) রমজানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরো বলেছেন,হে মানব সকল ! তোমরা তোমাদের আত্মাকে নিজ কামনা-বাসনার দাসে পরিণত করেছো,আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একে মুক্ত করো। তোমাদের পিঠ গোনাহর ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে,তাই সেজদাগুলোকে দীর্ঘায়িত করে পিঠকে হালকা করো। জেনে রাখ মহান আল্লাহ নিজ সম্মানের শপথ করে বলেছেন,রমজান মাসে নামাজ আদায়কারী ও সেজদাকারীদেরকে শাস্তি বা আজাব দিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের যে কেউ কোনো মুমিনকে ইফতারি দেবে,আল্লাহ তাঁকে এর বিনিময়ে একজন দাসকে মুক্ত করার সওয়াব দান করবেন এবং দয়াময় আল্লাহ তাঁর অতীতের গুনাহও ক্ষমা করে দেবেন।"

সাহাবীরা আরজ করলেন,অন্যদেরকে ইফতারি করানোর সামর্থ আমাদের সবার নেই।" তিনি বললেন,রোজাদারদের ইফতারি দেয়ার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে দূরে রাখ,আর সে ইফতারি যদি একটি খুরমার অর্ধেক বা এমনকি সামান্য পানিও হয়ে থাকে।"

নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি প্রকৃতই দূর্ভাগা বা হতভাগ্য যে রমজান মাস পেয়েও মহান আল্লাহর ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়।বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন আরো বলেছেন,রমজান মাসে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাধ্যমে কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবসের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা স্মরণ কর ।অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য কর ও সাদাকা দাও।বয়স্ক ও বৃদ্ধদেরকে সম্মান কর এবং শিশু ও ছোটদেরকে স্নেহ কর। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা কর । তোমাদের জিহবাকে সংযত রাখ,নিষিদ্ধ বা হারাম দৃশ্য দেখা থেকে চোখকে আবৃত রাখ,যেসব কথা শোনা ঠিক নয় সেসব শোনা থেকে কানকে নিবৃত রাখ। এতিমদেরকে দয়া কর যাতে তোমার সন্তানরা যদি এতিম হয় তাহলে তারাও যেন দয়া পায়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আরো বলেছেন,যারা এই মাসে অর্থাৎ পবিত্র রমজান মাসে নিজ ব্যবহার ও আচার আচরণকে সুন্দর করবে তারা সেদিন সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। যারা এই মাসে ভৃত্য বা অধীনস্তদের কাজ কমিয়ে দেবে মহান আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তার হিসাব সহজ করে দেবেন। যারা এই মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে মানুষকে বিরক্ত করা বা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে,বা অন্যদের দোষ ঢেকে রাখবে,কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ নিজ ক্রোধ থেকে তাদের রক্ষা করবেন। যারা রমজান মাসে এতীমকে আদর যত্ন বা সম্মান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে সম্মান করবেন। যারা এই মাসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে রহমতের ধারায় সিক্ত করবেন,আর যারা এই মাসে আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে বা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।"

ভূমিকা

মহান আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের মাস রামাযান। বছর ঘুরে মুমিনের জীবনে এ মাসের আগমন ঘটে তাক্বওয়া অর্জনের অনন্য সুযোগ হিসাবে। মুমিন ব্যক্তি তার রুগ্ন হৃদয়কে মাগফেরাত ও রহমতের স্বচ্ছ সলিলে পরিষ্কার করে নেয়। নেক আমলের পসরা দিয়ে ভরে নেয় আমলনামা। ছিয়াম, ক্বিয়াম, ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, তাসবীহ-তাহলীল সহ যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয় রামাযানের দিন-রাত। লাইলাতুল ক্বদরে হাযার মাসের ছওয়াব লাভের কোশেশও অব্যাহত থাকে। তবে ঈমান ও তাক্বওয়ার অনুপাতে বান্দার ইবাদতের তারতম্য হয়ে থাকে। যিনি যত বেশী পরহেযগার, তার ইবাদতের মাত্রা সেই অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আর যিনি দুর্বল ঈমানের অধিকারী তার ইবাদতও তার ঈমান অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। কিন্তু একথা সত্য যে, আল্লাহর বিশেষ রহমতের কারণে অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসে মুসলিমগণ কয়েক গুণ বেশী ইবাদত করে থাকেন। কিন্তু রামাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ ওঠার সাথে সাথে অধিকাংশের হৃদয় থেকে রামাযানের অর্ধেক প্রভাব মুছে যায়। তারা পুনরায় রামাযান পূর্ববর্তী জীবনে ফিরে যান। ঈদের দিনেই গাফলতি ও অলসতার ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যায় অবাধ্যতার অতল গহবরে। রামাযানের পরে সেই গাফলতির মধ্যে নিজেদের না ডুবিয়ে রামাযানার প্রভাব মনের মুকুরে জাগিয়ে রাখতে হবে। রমজান মাস সম্পর্কে নবী করিম (সা.)এর এই ভাষণের এক পর্যায়ে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! এ মাসের শ্রেষ্ঠ আমল কি?

রাসূল (সা.) বললেন,হে আবুল হাসান! এ মাসের শ্রেষ্ঠ কাজ বা আমল হলো নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

আলোচ্য নিবন্ধে রামাযানের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র- https://at-tahreek.com/article_details/11232

রমজান কি ?

এটি 'আরাবী' বার মাসগুলোর একটি, আর এটি দ্বীন ইসলামে একটি সম্মানিত মাস। সাহীহুল বুখারী ইমান অধ্যায় ও সাহীহ মুসলিম এ ইবনু উমার এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) বলেছেনঃ "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসে সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ (কা'বাহ)এর উদ্দেশ্যে হজ্জ করা"।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

" রমজান মাস হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কুরআন নাজিল হয়েছিল; মানবজাতির জন্য কোরান একটি হেদায়েত এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং মানদণ্ড [সঠিক ও ভুলের]। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ বেঁচে থাকে তবে এই মাসে রোজা রাখ এবং আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান; তিনি তোমাদের জন্য কষ্ট না চান; আর এটাই যে, তোমার সময়কাল পূর্ণ হবে এবং তোমার হেদায়েতের জন্য আল্লাহকে মহিমান্বিত করতে হবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।[কুরআন ২:১৮৫]

নাবী-সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেনঃ "যে রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করল, তা দশ মাসের (স্বাওম পালনের) সমতূল্য আর 'ঈদুল ফিত্বরের পর (শাউওয়ালের মাসের) ছয় দিন স্বাওম পালন করা গোটা বছরের (স্বাওম পালনের) সমতূল্য। [আর ইমাম আহমাদ (২১৭/০৬)]

[বি:দ্র: সূরা (৬) আল-আন'আমের ১৬০ নং আয়াত অনুসারে কোন মু'মিন কোন ভাল কাজ করলে আল্লাহ-তা'আলা-তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ ! তাই রামাদ্বান মাসে ৩০ দিন স্বাওম পালনের অর্থ এই দাঁড়ায় (৩০×১০)=৩০০ দিন অর্থাৎ দশ মাস স্বিয়াম পালন করা; আর (শাউওয়ালের মাসের) ছয় দিন স্বাওম পালন করার অর্থ দাঁড়ায় (৬×১০)=৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস স্বিয়াম পালন করা। সুতরাং রামাদ্বান ও এর পরবর্তী শাউওয়ালের ছয় দিন স্বাওম পালন করা (১০ মাস+২ মাস) = ১২ মাস অর্থাৎ গোটা বছরের সমতূল্য!]

তথ্যসূত্র-https://bn.wikipedia.org

রমজানের ইতিহাস

মক্কা বা মদিনায় ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে থেকেই রোজা রাখার রীতি ছিল। তবে বর্তমানে যেভাবে রোজা রাখা হয়, একেবারে শুরুর দিকে সেভাবে রাখা হতো না।ইসলামের নবী নিজে মাঝে মাঝে রোজা রাখলেও শুরুর দিকে উম্মত বা সাহাবীদের জন্য, বিশ্বাসীদের জন্য ৩০ রোজা রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না।ইসলামে রোজা বা রমজান ফরজ হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয় হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে। এরপর থেকেই অপরিবর্তিত রূপে সারা পৃথিবীতে রোজা পালন করা হচ্ছে। রমজানের মতো না হলেও ইহুদি এবং অন্যান্য আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও রোজার মতো সারাদিন পানাহার না করার ধর্মীয় রীতি দেখা যায়।তবে ইসলামের প্রধান পাঁচটি ধর্মীয় স্তম্ভের একটি হচ্ছে রোজা। অন্য চারটি ফরজ হচ্ছে ঈমান, নামাজ, যাকাত, হজ্জ।

যে বছর রোজা ফরজ করা হয়েছিল, তার দুই বছর আগে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে সাহাবীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন ইসলামের নবী।হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিমদের হিজরি সাল গণনা শুরু করা হয়।হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমজান মাসে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক বা ফরজ ঘোষণা করে আয়াত নাজিল হয় বলে ইসলাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাসুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, ''কোরানে যে আয়াত দিয়ে রোজা ফরজ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমুহের ওপরেও রোজা ফরজ ছিল।"

আল্লাহ তাআলা সে কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

যুগে যুগে রোজা

কোরআন মজিদের যে আয়াতটির মাধ্যমে রোজা ফরজ হয়, সেটিতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রোজা ফরজ ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য; যাতে তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো।' (সুরা বাকারা: ১৮৩)।

আদম (আ.)-এর যুগে

আদম (আ.)-এর সময় আইয়ামে বিজ তথা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে হতো। 'আইয়ামে বিজ' অর্থ শুভ্রতার দিনসমূহ। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাকালে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করায় তাঁদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। তাই ফেরেশতারা তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরাও তওবা করেন। ফলে তাঁদের গায়ের রং শুভ্র ও সুন্দর হয়। এরপর আল্লাহ আদম (আ.) ও তাঁর উম্মতকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রা.)

বলেন, ‘মহানবী (সা.) ঘরে ও সফরে আইয়ামে বিজে কখনো সিয়াম পালন না করে থাকতেন না।’ (নাসায়ি)

নুহ (আ.)-এর যুগে

নুহ (আ.)-এর যুগেও রোজা পালন করা হতো। মহানবী (সা.) বলেন, ‘নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ছাড়া গোটা বছর রোজা রাখতেন।’ (ইবনে মাজাহ)। তিনি আরও বলেন, ‘নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা ছিল। পরিশেষে রমজানের এক মাস সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ তা রহিত করেন।’ (ইবনে কাসির)

মুসা (আ.)-এর যুগে

মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্য আশুরার রোজা ফরজ ছিল। বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) মদিনায় আগমনের পর ইহুদিদের আশুরার রোজা পালন করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, ‘এটি এক শুভ দিন। এই দিনে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মুসা (আ.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওই দিনে রোজা রাখেন।’ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, ‘তাহলে আমি হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণে তোমাদের তুলনায় অধিক হকদার।’ (বুখারি)। এরপর মহানবী (সা.) আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবিদের রোজা রাখার নির্দেশ দেন। এরপর রমজানের রোজা ফরজ হলে আশুরার রোজা নফলে পরিণত হয়।

দাউদ (আ.)-এর যুগে

দাউদ (আ.) বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন আর ছয় মাস রোজা রাখতেন না। মহানবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় অতিবাহিত করতেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)

ঈসা (আ.)-এর যুগে

ঈসা (আ.)-এর উম্মতের সময়েও রোজার প্রচলন ছিল। ঈসা (আ.)-এর যখন জন্ম হয়, তখন জনগণ তাঁর মা মরিয়মকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমি করুণাময়ের উদ্দেশে রোজার মানত করেছি। আজ আমি মানুষের সঙ্গে মোটেই কথা বলব না।’ (সুরা মরিয়ম: ২৬)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঈসা (আ.) জঙ্গলে ৪০ দিন রোজা রেখেছিলেন। একদা ঈসা (আ.)-এর উম্মতগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে 'আমরা পাপাত্মাকে কীভাবে বের করব?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দোয়া ও রোজা ছাড়া তা অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।' (ইবনে হিশাম)

জাহিলি যুগে

জাহিলি যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'অন্ধকার যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে মহানবী (সা.) নিজে এবং মুসলমানগণও আশুরার রোজা পালন করেছেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হয়, তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'আশুরা দিবসসমূহের একটি। যে চায় সে ওই দিন রোজা রাখবে এবং যে চায় সে ওই দিন রোজা পরিহার করবে।' (বুখারি)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে। যা ছিল মহানবি (সা.)-এর কিবলা পরিবর্তনের সময় ও হিজরতের অষ্টাদশ মাস। মহানবি (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হওয়ার পর, পরে নবি ও রাসূলদের জামানার রোজার যে বিধান ছিল তার ফরজিয়াত রহিত হয়েছে। তবে আগে এ রোজাগুলো সুন্নতি আমল হিসাবে এখনো কার্যকর রয়েছে।

তথ্যসূত্র-https://www.bbc.com/bengali/articles/c3g54741n7xo

রমজানের গুরুত্ব

আল্লাহ্ আমাদের সাওমের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন।আল্লাহ্ সাওমকে এবং সাওমের প্রতিদানকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে আমাদেরকে সাওমের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ এজন্য এভাবে বলেছেন, যেন বান্দার অন্তরের মধ্যে সাওমের তাৎপর্য গেঁথে যায়। আর বান্দা যেন খুব গুরুত্ব দিয়ে ইবাদাতটি পাপন করে। যে দিনগুলোতে সাওম পালন করা হয়, সে দিনগুলো অন্যান্য দিনের মতো হওয়া উচিত নয়৷ এ দিনগুলো বিশেষ কিছু বিশেষত রামাদান মাসে। তাকওয়াকে যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সাওম হচ্ছে তাতে পৌঁছানোর একটি স্কুল। আর সেজন্যই এর গুরুত্ব সীমাহীন। কল্পনা করা যায় শেষ বিচারের দিনের কথা, সেদিন সবচেয়ে আপনজন,বাবা-মা কোনো কাজে আসবে না। কোনো মানুষ সাহায্য করতে পারবে না, সেদিনও এই সাওম কাজে আসবে! সাওম সেদিন ঢাল হয়ে রক্ষা করবে। এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা মুসলিমরা গভীরভাবে চিন্তা করতাম, উপলব্ধি করতাম, এবং সাওমের গুরুত্ব আর এর অপরিসীম প্রতিদানের কথা স্মরণ করতে পারতাম—তাহলে আমরা এই মাসে সাওমকে ফরয করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর প্রতি সিজদায় লুটিয়ে পড়তাম।

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।–[সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬]

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।–[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০]

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

সাওমের মিষ্টতা

আল্লাহ কুরআনে তাকওয়া অর্জনকে সাওমের এবং গুনাহ ও কুফর থেকে পুরে থাকাকে সালাতের উদ্দেশ্য বলেছেন। আর তাই আমরা যদি তাকওয়া অ ফাহশা কাজ থেকে বিরত থাকতে চাই, তবে সেটা সাওম পালন এবং আদায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। এগুলো অর্জনের বাইরেও অন্য স্তর আছে, যা আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য। আবার এই উপরের স্তরের মধ্যেও অন্য কিছু অভ্যন্তরীণ স্তর আছে, এই সকল স্তরের সংখ্যা অনেক এবং এসকল স্তরে উন্নীত হতে হলে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে ইবাদাত করে যেতে হবে। আর এই স্তরগুলো যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে পারবে, তাদের জন্যই বরাদ্দ।

এটা অনেকটা আমাদের ঈমানের মতো। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে আপনার ঈমানেরও এমন কিছু স্তর আছে। এই স্তর বিন্যাসের শুরুটা হয় ইসলাম দিয়ে, এর উপরে আছে ঈমান, আর এসবের উপরে তৃতীয় স্তরে আছে ইহসান। আর সাওমের উপরের স্তর হলো সাওমকে উপভোগ করতে পারা এবং এর মাঝে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। শুধু বিশেষ বিশেষ বান্দাই এই অনুভূতি উপভোগ করতে পারেন। এই অনুভূতি তখনই বাস্তব হয়ে ধরা দেয়, যদি সাওম পালন করার সময় সাওম পালনকারী ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন যে আল্লাহ তাঁকে দেখছেন। যেভাবে আমাদের প্রিয় নবিজি (সা) বলেছেন,

“ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন।“[সহিহ বুখারি: ৫০, সহিহ মুসলিম: ১০২]

রাসূল (সা) তাইফে গেলেন। এটা ছিল এমন এক পাহাড় যাতে চড়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। যখন তিনি পর্বতচূড়ায় পৌঁছলেন, তাইফবাসী পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত তাঁকে প্রস্তরবর্ষণ করতে থাকল। তাঁর শরীর জুড়ে রক্ত ঝড়ছিল, তিনি ক্লান্ত ছিলেন, হৃদয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল—তবুও সেই কঠিন সময়ে তিনি বলেছিলেন,

“ও আল্লাহ! আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে যা হয়েছে তা কিছুই না।” [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ১৮৫১রোজার বিনিময় জান্নাত]

তিনি যা বলেছেন তা যেন ছিল বরফশীতল পানির মতন যা কিনা অসম্ভৱ পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা মেটাতে সক্ষম। সুবহানআল্লাহ! কত সুন্দর উক্তি।

জান্নাত এমন এক স্থান, যেখানে শুধু সুখ আর সুখ, শান্তি আর শান্তি। উল্লাস, ফুর্তি, আনন্দগুবিনোদন ও খুশির মওজ সব সময় সেখানে চলমান। দুঃখগুদুর্দশা, বালা-মসিবত ও কষ্ট-ক্লেশের নামমাত্র সেখানে নেই। আমরা পৃথিবীতে একটি বাসা, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক হলে অত্যন্ত আনন্দিত হই। অথচ এ নিবাস ক্ষণিকের। আর পরকালের আবাস হবে চিরকালের। রোজার বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা চিরকালের বসবাসের জান্নাত দান করবেন। জান্নাতের নেয়ামতরাজির মোহময় বিবরণ দিয়ে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করেছি, যা কোনো চোখ কখনও দেখেনি, কোনো কান কখনও শোনেনি। এমনকি কোনো অন্তরে এর কল্পনাও উদয় হয়নি।’ (বোখারি : ৩২৪৪)।

রোজাদারের আনন্দ

শত্রুকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় দেখলে বা তাকে ঘায়েল করতে পারলে প্রত্যেকেই খুশি হয়। আর মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে এমন ভয়ংকর শত্রু যে, আল্লাহর বান্দাদের জাহান্নামে নেওয়ার জন্য মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে তৎপর রয়েছে। লোকদের নরকে নেওয়ার জন্য প্রাণপণে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রোজাদারের জন্য খুশির বিষয় হলো, রোজার মাসে এই চিরশত্রু শয়তান ও ক্ষতিকর দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘রমজান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৬৪২)। তা ছাড়া রোজাদারের জন্য রয়েছে বিশেষ দুটি আনন্দ। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘রোজা পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।’ (মুসলিম : ২৫৯৭)। রোজাদারের জন্য আরও খুশির বিষয় হলো, পুণ্য লাভের আশায় রোজা পালন করা হলে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমজানের রোজা পালন করে, তার আগের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’ (বোখারি : ৩৮)।

জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ

রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। একটি মোমবাতির সামান্য আগুনে নিজের আঙুল দশ সেকেন্ড ধরে রাখলে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা দেহজুড়ে শুরু হয়। এটা হলো দুনিয়ার আগুন। আর জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ শক্তিশালী হবে। সে আগুনে পোড়া কত ভয়ংকর ও বিপজ্জনক হবে, তা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। এমন আগুনের জ্বলন হতে দয়াময় আল্লাহতায়ালা রোজার বিনিময়ে মুক্তি দান করবেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য একদিনের রোজা রাখবে, আল্লাহতায়ালা তাকে এ দিনের বদলে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে নিয়ে যাবেন।' (মুসলিম : ২৬০১)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা রমজান মাসের প্রত্যেক দিনে ও রাতে অসংখ্য লোককে (দোজখ হতে) মুক্তি দান করেন।' অপর হাদিসে এসেছে, 'রোজা ঢালস্বরূপ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার দুর্গ সদৃশ।' অন্য এক হাদিসেও রোজাকে জাহান্নাম থেকে প্রতিরক্ষার ঢাল বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'রোজা ঢালস্বরূপ।' (বোখারি : ১৯০৪)।

রোজা অদ্বিতীয় ইবাদত

রোজা এক অনন্য ইবাদত। এর মাধ্যমে নেকির পাল্লা ভারী হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যার (নেকির) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবনযাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন- তা কী? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।' (সুরা কারিআ : ৬-১১)। আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, 'রোজাকে আঁকড়ে ধর। কেননা, রোজার সমতুল্য কোনো আমল নেই।' (সুনানে নাসায়ি : ২২২২)। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, রোজা রাখার মাধ্যমে অনেক পুণ্য অর্জিত হয় ও নেকির পাল্লা ভারী হয়। অন্য কোনো আমল করলে এত পরিমাণ পুণ্য পাওয়া যায় না, যত পরিমাণ পুণ্য রোজা পালন করার মাধ্যমে পাওয়া যায়। অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে, আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোনো একটি আমলের নির্দেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তুমি রোজা আঁকড়ে ধর। কেননা, রোজার কোনো বিকল্প নেই। (রোজা একটি অদ্বিতীয় ইবাদত)।' (সুনানে নাসায়ি : ২২২৩)।

রোজার সুপারিশ

কেয়ামত এমন এক কঠিন দিন, যেদিন কেউ কারও সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে না। সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভাই, মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। এমন কঠিন দিনে রোজাদারের মুক্তির জন্য রোজা সুপারিশ করবে। তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। কঠিন মসিবতের সময় পাশে দাঁড়াবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনবাসনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কোরআন বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' মহানবী (সা.) বলেন, 'তখন কোরআন ও রোজার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' (মুসনাদে আহমদ)।

দোয়া কবুল হওয়া

জীবন চলার পথে আমরা অভাব-অনটন, দুঃখগুদুর্দশা ও বালা-মসিবতের শিকার হই। উপর্যুপরি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জর্জরিত হয়ে পড়ি। এসব অবস্থায় আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হলেন আল্লাহ। তিনিই আমাদের সব ধরনের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তাই আমরা সুখে-দুঃখে ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করি। তিনি সবার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। কিন্তু রোজাদারের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রয়েছে (রমজানের) প্রত্যহ দিনরাতে গ্রহণযোগ্য দোয়া।' (অর্থাৎ রোজাদার প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়)। (মুসনাদে আহমদ : ৭৪৫০)।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।–[সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩]

عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।–[সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩]

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।

তথ্যসূত্র-https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/islamosomaj/166139/

রমজানের ফযীলত

“সাওম কেবল আমারই জন্য”

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, “বনি আদমের সকল আমল তার নিজের জন্য, শুধু সাওম ছাড়া। নিশ্চয় তা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব। [বুখারি: ১৯০৪, মুসলিম: ২৭৬০]

এটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসী। হাদিসে কুদসী হলো সেই সমস্ত হাদিস যার বক্তব্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার, কিন্তু রাসূল ( ) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এসব হাদিসের ভাব আল্লাহর এবং ভাষা আল্লাহর রাসূলের। কুরআনের সাথে হাদিসে কুদসীর পার্থক্য হলো হাদিসে কুদসীকে সালাতে তিলাওয়াত করা যায় না এবং এ হাদিস পাঠে সাধারণ সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমনটা অন্যান্য হাদিস পাঠের জন্য সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু কুরআন পাঠে প্রতি অক্ষরে দশ নেকীর যে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে, তা হাদিসে কুদসীর জন্য প্রযোজ্য নয়। আরেকটি ব্যাপার হলো, হাদিসে কুদসীকে অন্যান্য হাদিসের মতোই যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ রয়েছে। মুহাদ্দিসীনরা হাদিসে কুদসীর মধ্যে কিছু কিছুকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন আবার কিছু কিছুকে গ্রহণ করেননি। মোটকথা হাদিসে কুদসীকে কেবল এজন্য বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা যাবে না যে, এটা হাদিসে কুদসী, বরং উলামাদের তাহকীক অনুসারে তার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করে গ্রহণ বা বর্জনের

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক কাজ তার নিজের জন্য, ব্যতিক্রম কেবল সাওম সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং তিনি নিজেই এর পুরস্কার দেবেন। এটা তো আমরা জানি যে, সব নেক কাজই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়। তাহলে আল্লাহ কেন সাওমকে আলাদাভাবে তাঁর নিজের জন্য বলে ঘোষণা করলেন? সাওম কীভাবে অন্যান্য ইবাদাতের থেকে আলাদা?

“সাওম কেবল আমারই জন্য”—আল্লাহর এ ঘোষণাকে খুব সাধারণ মনে হলেও লক্ষণীয় যে, আহমাদ ইবনু ইসমাঈল ক্বাজউইনি (৯) তাঁর হাজাইর আল কুদস বইয়ে এই ব্যাপারে অনেকগুলো মতবাদ তুলে ধরেছেন। যেমনঃ

সাওমের মাধ্যমে ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে থাকে। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য মূলত তিন ধরনের হয়।

প্রথমত, আল্লাহর আনুগত্য করে যাবার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। তৃতীয় প্রকার হলো, আল্লাহর বিধান আর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে, যে কোনো দুনিয়াবি কাজের জন্য এবং অন্য ইবাদাতের জন্য এই তিন প্রকার ধৈর্যের মধ্যে যেকোনো একটির দরকার হয়। কিন্তু সাওম পালনের ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের ধৈর্যই প্রয়োজন হয়।

যেমন প্রথমত, সাওম পালন করতে হলে অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকার পরীক্ষা দিতে হবে। যথাযথভাবে সাওম পালনের জন্য সাওমের সময়টুকুতে সর্বপ্রকার পানাহার বর্জন করতে হবে, স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করতে হবে। রামাদান মাসে দিনের বেলায় এই কাজগুলো হারাম হয়ে যায়। অথচ এমনিতে এগুলো হালাল কাজ। আর যেগুলো সব সময়ের জন্য হারাম, সেসব তো বর্জন করতে হবেই। যেমন- গীবত, পরচর্চা, গালি দেওয়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। এগুলো সবসময়ের জন্যই হারাম, আর রামাদানে এগুলোতে লিপ্ত হওয়া তো আরো ভয়ানক গুনাহ। এ কারণেই হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর আদেশ মানার জন্যেও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। কেও হয়তো কঠিন সময় পার করছেন, মন চাইছে না সাওম রাখতে, কিন্তু আল্লাহ্ হুকুম করেছেন রাখার জন্য। নিজের নফসের বিরুদ্ধে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তবেই সাওম রাখতে হবে। এটা একটা কঠিন পরীক্ষা, যাতে সাওম পালনকারীকে উত্তীর্ণ হতে হয়। আল্লাহ্ বলেন-

-... মানুষের প্রবৃত্তি মন্দের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে ...।" (সুরাহ ইউসুফ ১২:৫৩)

তবে কেউ যদি সাওম পালন এজন্য ঘৃণা করে যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, তাহলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে তো ঘৃণাকারীর ঈমানই চলে যাবে, বরং এই ব্যক্তিকে আবার নতুন করে শাহাদাহ পাঠ করে ঈমান আনতে হবে। তবে আমরা যেটার কথা বলছি সেখানে বান্দা সাওমকে ঘৃণা করে না, তবে তার অন্তর তাকে আল্লাহর হুকুম মানতে বাধা দেয়। তখন তাকে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাওম পালন করতে হয়।

তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও নিজের তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার পরীক্ষা। যেমন- প্রচন্ড গরমের দিন। এই উত্তাপ এই আবহাওয়া আল্লাহরই সৃষ্টি। আবার আল্লাহই আদেশ করেছেন এমন উত্তপ্ত দিনে সাওম রাখার। কাজেই আল্লাহর এই ফয়সালা মেনে নিতে হবে। কখনো হয়তো কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, কখনো অবসাদ আর ক্লান্তি অনুভব করবেন, পিপাসার্ত হলে কিন্তু সেই মুহূর্তেও আল্লাহর হুকুমের ওপর অটল থাকতে হবে এবং সাওম পালন করে যেতে হবে। প্রচণ্ড গরম, শরীর আর মনের কষ্ট—এ সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। নিজের তাকদীর আর আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা দিয়েই সাওম পালন করতে হবে।

এভাবে সাওমের মধ্যে ধৈর্যের তিনটি প্রকারই একত্রিত হয়। আর এজন্যই সাওমের প্রতিদান অনেক অনেক বেশি, যে কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাওমকে কেবল তাঁর নিজের জন্য বলে উল্লেখ করেছেন আর এর পুরস্কারের ব্যাপারে বলেছেন,

"আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।"

আর আল্লাহ্ ছাড়া সাওমের প্রকৃত পুরস্কার কেউই জানে না।

আরেকটি মতবাদ হলো;

কিয়ামাতের দিনও সাওমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এ ব্যাপারে ষষ্ঠ মতামত হিসেবে সুফিয়ান ইবনু উন্নায়নাহ (এ)-এর মতটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন সাওমকে আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁর জন্য বলেছেন এর কারণ হলো, সাওম এমন একটি ইবাদাত যার সাওয়াব কিয়ামাতের দিনেও অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিয়ামাতের ময়দানে যেসব মানুষ একে অপরের প্রতি জুলুন করেছে, অন্যের হক নষ্ট করেছে, তাদের থেকে সাওয়াব নিয়ে নেওয়া হবে। দুনিয়াতে একজন মানুষ আরেকজনের হক নষ্ট করে থাকলে সেদিন হক নষ্টকারী ব্যক্তির আমলনামা থেকে নেকী ছিনিয়ে নিয়ে যার হক নষ্ট করেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। সব ধরনের নেক আমলের সাওয়াবই নিয়ে নেওয়া হবে, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে সাওম।

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই সবাইকে যার যার হিসেব পূরণ করতে হবে, আর এই হিসেব টাকা দিয়ে পূরণ হবার নয়। যদি টাকা দিয়ে এই হিসাব থেকে পার পাওয়া যেত, তবে সেটা অনেক সহজ হতো। কিন্তু ঐদিন যার যার নেক কাজ দিয়েই মজলুমের পাওনা শোধ করতে হবে। যদি আমি কারো হক নষ্ট করে থাকি, সেদিন সে আমার নেক আমলের অংশ নিয়ে যাবে। আবার অন্য কেউ আমার হক নষ্ট করলে আমি তার আমল নিয়ে নেব। আল্লাহ্ আমাদের এমন পরিস্থিতি থেকে হিফাযত করুন। সেই কঠিন সময়ে হয়তো এমন হবে, কারো অনেক সালাত আছে, যাকাত আছে, সাদাকা আছে, হজ্জ-উমরাহ আছে, কিন্তু সেদিন এসমস্ত নেকী তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যার হক সে নষ্ট করেছে, তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি নেক আমল এভাবে দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়, তবে মজলুমের গুনাহ নিয়ে হক নষ্টকারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম সাওম। সাওমের নেকী আমলকারীর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে না। সুফিয়ান আল উয়ায়নাহর মতে এটার কারণ হলো— আল্লাহ্ সাওমকে তাঁর নিজের বলে অভিহিত করেছেন, তাই সাওমের সাওয়াব নিয়ে নেওয়া হবে না।

রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন।

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে

আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, ''প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

إسناده حسن، ان شاء الله : ،(1478).

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।–[মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে ‘রাইয়ান’ নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা’দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

: لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر ،يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.

وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।–[সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪]

রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

،الصائم لا ترد دعوته

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

،صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس)

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩

এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব

সহিহ আল বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, নবিজি (সা) ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রামাদান মাসেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল মানুষ, যে মাসে জিবরীল (আ) তাঁর সাথে কুরআন পড়তে আসতেন আর একে অন্যের সাথে মিলিয়ে নিতেন। ইবনু আব্বাসের ভাষায়, আল্লাহর রাসূল (সা) ছিলেন বহমান বাতাসের চাইতেও উদার।

কেন ইবনু আব্বাস (রা) নবিজি (সা)-এর উদারতাকে বহমান বাতাসের সাথে তুলনা করলেন? এর কারণ প্রথমত, তিনি দান করার ব্যাপারে এতটুকু বিলম্ব করতেন না— বাতাসের গতিতে দান করতেন। দ্বিতীয়ত, দান করার ব্যাপারে তিনি কখনো বৈষম্য করেননি। বাতাস যেমন সকলকে ছুঁয়ে যায়, ঠিক তেমনই ছিল নবিজি (সা)-এর উদার হাত তাঁর দানশীলতাও সকলকে ছুঁয়ে যেত।

ইমাম শাফি'ঈ (রা) বলেছেন, "আমি চাই মানুষ যেন রামাদানে উদারহস্তে দান খয়রাত করে, এটাই নবিজি (সা)-এর দেখানো পথ।" দেখা যায় রামাদানে অনেকেই সালাত আর ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সাদাকার বিষয়টি পাত্তা দেয় না। সালাফরা বলতেন, রাদামান মানেই হলো কুরআন ও দান সাদাকার মাস, আর কিছু না। অর্থাৎ রামাদান মাসে অন্য কিছুর সাওয়াব এগুলোর সমান নয়।

আল্লাহর চোখে দানের পরিমাণ মুখ্য না, বরং দান করছেন কি না সেটাই আসল বিষয়। অনেকে কম পরিমাণ সাদাকা করতে পারে, সেটা সমস্যা না। কারণ, আল্লাহর চোখে এক টাকা দশ লক্ষ টাকার সমান হতে পারে। সুনানে নাসাঈতে বলা আছে, "এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব।" [সুনানে নাসাঈ : ২৫২৭]

তথ্যসূত্র-বই-ধূলিমলিন উপহার রমাদান, https://www.alkawsar.com/bn/article/642/

রমজানের তাৎপর্য ও শিক্ষা

রমজান মাস সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস। রাসূলেপাক (সা.) একে আখ্যায়িত করেছেন শাহরুল মাওয়াছাত বা সমবেদনা ও সহমর্মিতার মাস বলে। গরিব-দুঃখী, দুস্থ, অনাথ, কাঙ্গালদের ব্যথা-কষ্ট দূর করার জন্য এ মাসে আরও অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। কেবল ধনীরাই দান করবে, তা নয়। তারা তাদের মতো করবে, আমরাও পারি আমাদের মতো করতে। আমার ইফতারির জন্য ৫টা আইটেমের জায়গায় ৩টা আইটেম করে বাকি দুটো বা দুটোর পয়সা দিতে পারি আমাদের অভাবগ্রস্ত নিকট-প্রতিবেশীকে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রাসূলে করিম (সা.)-এর সেই সাবধান বাণী, খোদার কসম, সে ব্যক্তি মোমেন নয়, যে পেট পুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী অনাহারী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায়। রাসূলে করিম (সা.) আরও বলেছেন, আর যদি না পারো তবে তোমাদের তরকারিতে একটু বেশি করে সুরওয়া বা ঝোল দিও এবং তা প্রতিবেশীকে পৌঁছিও। কত বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ একথা। আসলে লাখ টাকা দান করাই বড় কথা নয়, আমার যা আছে তা থেকে যতটা সম্ভব দেয়াই বড় কথা। এটা একটা মানসিকতা। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ প্রতিবেশীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতাম, তবে সমাজে এ হাহাকার থাকতে পারতো না। নিজ বাড়ির আশপাশের ৪০ ঘর হচ্ছে প্রতিবেশী। প্রত্যেকেই যদি এ ৪০ ঘরের খোঁজ-খবর রাখে, সাধ্যানুযায়ী তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য সচেষ্ট হয়, তবে সমাজের অবস্থা পাল্টে যেতে পারে। ধর্মপরায়ণতা প্রদর্শনীর ব্যাপার নয়, অন্তরের। তেমনি সওয়াব আড়ম্বরতার মধ্যে নেই, তা নিয়ত বা মননের মধ্যে। যিনি দোকানদার তিনি রোজাদারদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এই পবিত্র মাসের ফজিলতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি যা ন্যায্যমূল্য তাই রাখে বা অন্য সময়ের তুলনায় একটু কম রাখে তবে অবশ্যই সে এর জন্য সওয়াব পাবে। এভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ সাধ্যসীমার মধ্যে কিছু না কিছু অবশ্যই করতে পারে।

রমজান মাসে ভালো ভালো খাবার আর ভূরিভোজনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সারা দিন অনাহারে থাকার মাসুল সুদে-আসলে পুরিয়ে নেয়ার জন্য সেহরি ও ইফতারিতে অধিক আয়োজন ও খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। আসলে এতে রোজার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ মাস তো কৃচ্ছতা সাধনের। সংযম সাধনার। রোজার মূল উদ্দেশ্য কামভাব ও প্রবৃত্তি দমন। কিন্তু অতিরিক্ত আহারের দ্বারা তা সফল হলো কোথায়?

শেখ সাদী বলেছেন, পেট ও শরীর পূজারীদের অন্তর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোক থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই অপচয় না করে বরং দৈনন্দিন রুটিন খাবার থেকে কিছু বাঁচিয়ে পাশের অনাহারী লোকদের মুখে যদি তা তুলে দেয়া যায় এর দ্বারাই রোজার মূল লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহ পানাহার করেন না। নিদ্রা-তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি রাব্বুল আলামীন, মহান প্রতিপালক, রোজার মধ্যে দিয়ে তার এই গুণাবলী আত্মস্থ করার চেষ্টা চালানো হয়। তাই আজকে আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেন রোজার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হই এবং রমজানের দাহনে সব পাপ-পংকিলতাকে ভস্মিভূত করে পবিত্র দেহ, মন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

তথ্যসূত্র https://old.dailyinqilab.com/article/288998/

শেষ কথা

রামাযানের প্রভাব ধরে রাখতে হ'লে রামাযানের আগে থেকেই এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য। সালাফে ছালেহীন শা'বান মাস থেকে এর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিতেন। যারা রামাযান মাসে তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঈদের আনন্দ মূলত তাদের জন্যই। আলী (রা.) রামাযানের শেষ রাতে লোকদের ডেকে বলতেন,

يا ليت شعري من هذا المقبولُ فنهنيه، ومن هذا المحرومُ فنعزِّيه؟ أيُّها المقبولُ: هنيئًا لك، أيُّهَا المردودُ: جبر اللهُ مصيبتك،

'হায় আফসোস! আমি তো জানি না, কার আমল কবুল হয়েছে যাকে আমি অভিনন্দন জানাবো, আর কার আমল কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে যাকে আমি সমবেদনা জানাব। হে যার আমল গ্রহণ করা হয়েছে! তোমার জন্য সুসংবাদ। আর হে যার আমল কবুল না হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! দো'আ করছি আল্লাহ তোমার মুছীবত দূর করে দিন'। [ইবনু রজব, লাত্বাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২১০]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন

ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد، ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له, الذنوب،

'যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে, তার জন্য ঈদ নয়; বরং ঈদের আনন্দ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর প্রতি যার আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ব্যক্তি বাহন ও পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, ঈদের আনন্দ তার জন্য নয়। ঈদের খুশি তো কেবল সেই ব্যক্তির জন্য, যার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।

সুতরাং শুধু দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, হরেক রকম খাদ্য খাওয়ার মধ্যে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না; রবং রামাযান ব্যাপী তাক্বওয়ার শিক্ষা নিয়ে সারা বছর জীবন পরিচালনার অনুপ্রেরণা ও পাপ বর্জনের সংকল্প নেওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত খুশি ও তৃপ্তির আমেজ পাওয়া যায়। হাসান বাছরী (রহ.) বলেন,كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللهُ فِيْهِ فَهُوَ عِيْدٌ، فَالْيَوْمُ الَّذِيْ يَقْطَعُهُ الْمُؤْمِنُ فِيْ طَاعَةِ مَوْلَاهُ وَذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ فَهُوَ لَهُ عِيْدٌ، 'প্রত্যেক ঐ দিন মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিন সে আল্লাহর অবাধ্য হয় না (পাপ করে না)। ঐ দিনটি মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিনটি সে প্রভুর আনুগত্যে, তাঁর স্মরণে এবং তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করে'।মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে পরিষ্কার রাখুন, রামাযানের ঈমানী প্রভাব সারা বছর যত্নের সাথে ধরে রাখার শক্তি দান করুন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁর আনুগত্যে যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

Assignment Prepared By

Mrs Kaniz Fatema Dina

Batch-202

Roll-20102093202

Address- 100, Rasulpur, Dhonia, Jatrabari, Dhaka

Mobile No: 01755826887

Email Address: kanizdina817@gmail.com

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কানিজ ফাতেমা দিনা। আমি বর্তমানে ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসায় আলিম কোর্সে অধ্যয়নরত আছি।পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত খিলগাঁও মডেল কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী। আমি অনার্স সম্পূর্ণ করেছি চট্টগ্রাম হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ থেকে।বর্তমানে পরিবার সহ ঢাকা যাত্রাবাড়ীতে বসবাস করছি। আমি ইসলামিক বই পড়তে পছন্দ করি।আমপারা হিফয করেছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন ২৯পারা পড়ছি।আমার অনেক ইচ্ছা আছে হাফেজা হওয়ার।রব যেনো আমার চেষ্টা কবুল করেন। এছাড়া 'ইকরা' নামের একটি অনলাইন প্রতিষ্ঠানে সূরা ওয়াকিয়া এর মুকাররিরাহ হিসেবে আছি। নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান আরো বিস্তৃত করার পাশাপাশি অন্য বোনদেরকে শিখানোর মাধ্যমে ইলম গুলোকে নিয়মিত আমলে পরিণত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি।কারন সহিহ বুখারীতে আমাদের প্রিয় রাসূল(সা) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।"